# ছোটবেলার স্মৃতি

সুতপা বড়ুয়া

শুনেছি বয়স হলে পুরনো দিনের স্মৃতি বেশি করে মনে পড়ে। বয়সের কথা বেশি না বলাই ভালো কিন্তু আমার ছোটবেলার স্মৃতি এতই ঘটনাবহুল, যে মনে হয় লিখলে মন্দ হত না. হয়ত কারু ভালো লাগলেও লাগতে পারে।

মায়ের মুখে শোনা, যে বাড়িতে আমরা ভাড়া থাকতাম, তার দোতলার বারান্দায় দাড়িয়ে নীচের রাস্তায় কোনো ছোট বাচ্ছা যেতে দেখলেই আমি নাকি আমার খেলনা গুলো ওপর থেকে ছুড়ে ফেলতাম। আমার মা'র ধারণা আমি ওদের সঙ্গে খেলতে চাইতাম তাই ওরকম করতাম, মাকে সোনামুখ করে এও বলতে শুনেছি, 'অন্য বাচ্চারা যেখানে নিজের খেলনা কাউকে দিতে চায় না, সেখানে আমার মেয়ে অন্যদেরকে ওর খেলনা বিলিয়ে দিত।' হায়রে ময়ের মন! আসলে হয়ত সব ছোট বাচ্চার মতই জানালা বা বারান্দা থেকে খেলনা ছুড়ে ফেলে দেয়াটা আমার একটা নির্দোষ দুষ্টুমিই ছিল, যা প্রায় সব ছোটরাই কোনো না কোনো সময় করে অনাবিল আনন্দ পেয়েছে! কিন্তু সব মায়ের মতই আমার মাও মনে করতে চেয়েছেন তার মেয়ে (বা ছেলে) অন্যদের মত নয়, সে আরও ভালো। মায়েরা বড় একচোখা হয়, তাই না?

যা হোক, আমাকে বাপের বাড়িতে বোনের কাছে জিম্মা রেখে মা সরকারী চাকরি করতে যেতেন, দিনের শেষে আবার বুকের ধন কোলে করে ঘরে ফিরতেন। মা তো মায়ের জায়গায় রয়েছেন, কিন্তু আমার সেই মাসি আজও আমার সবচেয়ে প্রিয় আত্বীয় আর আমিও যেন অন্য সব ভাগ্নে ভাগ্নিদের মধ্যে একটা বিশেষ জায়গা করে নিয়েছিলাম তার মনে। সেই স্নেহের বন্ধন আজও অটুট! আজকের দিনের কোনো চাইল্ড কেআরার, বা আন্টি সেই জায়গা নিতে পারে কিনা জানিনা। কিছুদিন পরেই মা বাবার সঙ্গে বিলেত গিয়ে (তখনও লন্ডন এর চাইতে বিলেত শব্দটাই বেশি চালু ছিল) সেরকমই এক আন্টির কাছে আমাকে রাখতে চাইলে, শুনেছি কান্না কাটি তো করতামই, এমনকি সেই আন্টি কে চিমটি, খামচিও দিয়েছি। আবার সেরকমই এক আন্টির মেয়ে জেনি আমার প্রথম প্রিয় বান্ধবী। মনে আছে আমি বাঙালি বাচ্চার মত মুখ খুলে চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছি দেখে জেনির মা আমাকে মুখ বন্ধ করে কি করে চিবাতে হয় দেখিয়ে দিয়েছিলেন. এর কিছুক্ষণ পর উনি খেয়াল করে দেখেন যে সবার খাওয়া হয়ে গেলেও আমার প্লেটে তখনো সব পড়ে রয়েছে অথচ আমি খাচ্ছি বলেই মনে হচ্ছে. আরো কিছুক্ষণ খেয়াল করে উনি বুঝলেন যে আমি কেবল চিবিয়েই চলেছি, কিন্তু গিলছি না ( কারণ উনি তো আমাকে গিলতে বলেন নি, আমিও তাই প্রানপনে চিবাচ্ছি তো চিবাচ্ছিই, গিলছি আর না!)

মা বাবার সঙ্গে ছোট্টবেলায় বিলেতে কয়েকবছর কাটিয়ে যখন ফিরলাম তখনো আমি ছোটই। অত ছোট বাচ্চা কেমন গড়গড় করে ইংরেজি বলতে পারে, সেটা আত্বীয় স্বজনদের দেখাবার জন্য মায়ের আমার চেষ্টার অন্ত ছিল না, কিন্তু যদিও আমি ইংরিজিতেই বেশি স্বচ্ছন্দ ছিলাম, কোনো এক কারণে দেশে ফিরে আর কিছুতেই ইংরিজি বলতে চাইছিলাম না। এই রোগটা আমার বড় হয়েও সারে নি. দেশে থাকতেও দেখেছি, এক ঘর বাঙালির মধ্যে বিনা প্রয়োজনে নিজেকে স্মার্ট প্রতিপন্ন করার জন্য অনেকেই যেখানে ইংলিশ বা বাংলিশ ( ইংরিজির আধিক্য সহকারে বাংলা বলা) বলতে পছন্দ করতেন, আমার কাছে তখনো এবং আজও ব্যাপারটা বেশ হাস্যকরই মনে হয়। যাক সে কথা, ছোটবেলায় ফিরে আসি আবার.... মামা মাসির মুখে গল্প শুনেছি, প্রচন্ড গরমে যখন ঘাম হচ্ছিল, আমি আতঙ্কিত মুখে দৌড়ে এসে সবার সামনে মাকে বলেছিলাম, " মামনি, আমার পিঠ গলে যাচ্ছে!!" আর নতুন শোনা 'মশা' ভুলে গিয়ে গায়ে চাক চাক মশার কামড় দেখিয়ে তেমনি সিরিয়াসলি বলেছিলাম," দেখনা,

কত্ত গুলো ফশা কামড়েছে!" ইংরিজিতে কথা বলছি না কেন জিগ্গেস করায় গম্ভীর মুখে বলেছিলাম, "এখানে কেউ তো ইংলিশ বলছে না, শুধু আমিই কেন বলব?" পাঠক বিবেচনা করুন, পাঁচ বছরের মেয়ের পক্ষে যুক্তিটা কি খারাপ ছিল?

এই ইংরিজি বলার প্রতি মুগ্ধতা অনেক বাঙালি মায়ের মতই আমার মায়েরও কাটেনি বহু বছর। ছোট বেলা থেকেই আমাকে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ানোয়, অনেক বছর বরং বাংলাতেই আমি কাঁচা রয়ে যাই, যেটা অনেক যত্ন করে, পরে বড় হয়ে আমি সংশোধন করেছি। আমি যখন ইংরিজি গল্পের বই পড়তাম, মা নাকি ভাবতেন, কিছুতেই আমি এত মোটামোটা ইংরিজি বই বুঝে পড়ছি না, নেহাতই সামনে ধরে বসে আছি!! শেষে একদিন বই পড়ে কাঁদতে দেখে মার প্রত্যয় হয় যে, না, সত্যিই আমি বুঝে পড়ছি। নিজে বিলেত ফেরত হওয়া সত্ত্বেও বহু বছর পরও আমার মেজ ননদের দুই বাচ্চা লন্ডন থেকে বাংলাদেশে বেড়াতে আসলে আমার মাকে মুগ্ধ গলায় বলতে শুনেছি, " ইসসস! মেয়েদুটো কি অনর্গল ইংরিজিতে কথা বলে!"

আবার সেই ননদই, মেয়েরা confused হবে বলে ঘরেও তাদের সঙ্গে ইংরিজি বলায় ওরা মোটেই বাংলা বলতে শেখে নি, এবং আমার মেয়ে পিয়াকে দু বছরের নিয়ে যখন একবার ওদের কাছে লন্ডন বেড়াতে যাই, ওর পাকা পাকা কথা শুনে ওনাকেও (ননদ কে) বলতে শুনেছি, "ইসস! মেয়েটা কি সুন্দর বাংলা বলে!" পাঠক বুঝুন, বাঙালির ঘরের বাংলাদেশী মেয়ে বাংলায় কথা বলছে, সেটাও ক্ষেত্র বিশেষে তারিফ পায়!

যাহোক, হচ্ছিল আমার ছোটবেলার কথা, এর মধ্যে কেমন করে যেন আমার মেয়ের ছোটবেলা ঢুকে পড়েছে. পাঠক মাফ করবেন।

তো সেই পূর্বোক্ত মামাবাড়ি ঘিরে আমার বিস্তর সুমধুর স্মৃতির কয়েকটা শুধু বলি:

বাবা চাবাগানের ম্যানেজার হওয়ায়, আমার ছোট বেলা কেটেছে দার্জিলিং আর আসামের চা বাগানে, কিন্তু বছরে একবার বাই এয়ার কলকাতায় মামাবাড়ি বেড়াতে আসতাম, আর মাকে দেখতাম নারকেলের নাড়ু, বরফি, ঘি টুকিটাকি বয়ম ভরে নিয়ে যেতে. তেমনি ফেরার সময় দিদা দিয়ে দিতেন লেবুর জারক (জামাইয়ের বিশেষ পছন্দ বলে), আমার জন্য আমার প্রিয় মাটির ভারে জমানো মিষ্টি,লাল দই আরও কত কি! সে দই এর স্বাদ যেন আজও মুখে লেগে আছে, আর তার সঙ্গে দিদার সজল চোখের সোহাগ মাখা চাউনিটুকু এখন বড় বেশি মনে পড়ে। আরও মনে পড়ে কোনো এক মামা কিম্বা মাসির বিয়ে উপলক্ষে হাজির হওয়া এক পাল মামাত, মাসতুত ভাই বোনের দঙ্গল সারা দুপুর ঝড়ের বেগে একতলা, দুতলা, ছাদ, চিলেকোঠা, ঝুলবারান্দা চষে ফেলতাম এবং সবাই নানা কাজে এতই ব্যস্ত যে আমাদের নিয়ে কারো মাথা ব্যথাই ছিল না। তারই মধ্যে ছাদে দোলদাদুর ( সোজা দাড়িয়ে বাচ্চাদের দুই পা'এর ফাকে দোলাতেন বলে ওনার ওই নাম আমিই দিয়েছিলাম) সযত্নে চর্চিত গাছের টব এর দু একটা শহীদ হত, চিমটি দাদুর (ইনি আমার মা'এর বাবা এবং বাচ্চাদের চিমটি কাটা ওনার আদরের বহি:প্রকাশের অন্যতম পন্থা ছিল) চশমার ডাঁটি ভাঙ্গা, বা বেওয়ারিশ পড়ে থাকা হোমিওপ্যাথির বোতল থেকে মিষ্টি মিষ্টি ওষুধের গুলি চেখে দেখা, সবকিছুতেই যেন পেতাম দেড়শ মজা, যা ঠিক চা বাগানের ম্যানেজার এর বাংলোতে একা একা কল্পনা করাও দুষ্কর ছিল।

ওরই মধ্যে ঠিকই খাবার সময় মস্ত বড় এক কাঁসার থালায় গরম গরম ফেনাভাত এর সঙ্গে ঘি, আলু ভাতে আর ডিম সেদ্ধ মেখে ছোট দিদা সব্বাইকে গোল করে বসিয়ে গ্রাস করে করে খাইয়ে দিতেন, সে যেন অমৃতের মত লাগত! বড় হয়ে অনেকবার সেটা replicate করতে চেষ্টা করেছি, চেহারা

একইরকম হলেও, স্বাদএ বিস্তর ফারাক থেকে যেত. আসলে তখন কোথায় পাব সেই অনাবিল শিশু মন আর কোথায় পাব সেই প্রিয়জনদের সঙ্গসুখ, যা সাধারণ ফেনাভাতকেও করে তুলত অমৃত!

এরই মধ্যে এসে যেত বিয়ের নিমন্ত্রণের মহেন্দ্রক্ষণ। আজ থেকে তিন চার দশক আগের কথা বলছি (ইচ্ছে করেই সঠিক হিসাবটা দিলাম না, পাঠক নিশ্চই বুঝতে পেরেছেন কেন), মনে হলে আশ্চর্যই লাগে যে তখনো আমার দাদুদের মত কলকাতার এক মধ্যবিত্ত যৌথ পরিবারের গৃহকর্তা কে দেখেছি বিয়েবাড়ির সব নায়োরী মহিলা এবং মেয়েদের জন্য আলাদা আলাদা রজনীগন্ধা/গোলাপের ছোট ছোট মালা (খোপায় জড়ানোর জন্য) এবং দু এক বোতল whitex এর যোগান দিতে। whitex জিনিসটা ছিল শ্যামাঙ্গী দের ফর্সা দেখাবার কিছু একটা লোসন, যেটার সমতুল্য বোধয় আজকের দিনের make-up foundation.

সারা বাড়িতে হই হই কান্ড, রই রই ব্যাপার! মহিলারা সকাল থেকে সর-হলুদ মেখে রিঠে* ভিজিয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছেন স্নানে যাওয়ার,কারণ স্নানার্থীর তুলনায় স্নানঘরএর সংখ্যা নেহাতই অপ্রতুল (* রিঠে হচ্ছে সে সময়ের শ্যামপুর বিকল্প একরকমের শুকনো ফল যা ভিজিয়ে, কচলে যে ফেনা হয় তা দিয়ে মাথা ধোওয়া হত)। ওদিকে মাঝের কামরায় ঘটে চলেছে আরেক নীরব নাটিকা! বিয়েবাড়িতে পড়বেন বলে রুমালে বেঁধে যে গয়নার পুটলিটা এনেছিলেন রাঙ্গামামী, তা পাওয়া যাচ্ছে না!! গয়নার শোকে মামী যখন মুহুর্মুহু অজ্ঞান হচ্ছেন তখনই কে যেন সিঁড়ির কোণে জমিয়ে রাখা ঘর ঝাঁট দেওয়া ধূলো ময়লার মধ্যে আবিস্কার করলো সেই মহামূল্যবান পুটলি! কেমন করে সেটা ওখানে গেল সেই প্রশ্ন আর কেউ তোলেনি। যাহোক, প্রাণ বাঁচলো রাঙ্গামামীর আর মাণ বাঁচলো গৃহকর্তার।

সব দিক সামলে বিকেল থেকে মা মাসি, মামীরা প্রানপনে চেষ্টা করে যাচ্ছেন বাড়িতে যে দুতিন টা ড্রেসিং টেবিল রয়েছে, তাতে এর ঘাড়ের ওপর দিয়ে, তার কানের পাস ঘেঁসে নিজের চেহারাটা যতটা সম্ভব বিয়েবাড়ি উপযোগী করে তুলতে, তারই মধ্যে একে অন্যকে শাড়ির কুঁচি ঠিক করে দেওয়া বা সেফটি পিন লাগিয়ে দেওয়ার মাঝেই লেটেস্ট PNPC (যা কিনা পরনিন্দা পরচর্চার সাংকেতিক শব্দ) সমানে জারি! সবকিছুরই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, কোথাও কোনো রাগ অভিমান কান্নাকাটি নেই, সবাই হাসিমুখে একে অন্যকে সাহায্য করছে, আর ছোটরাও বাদ যাচ্ছে না। মাথার ফিতের ফুল বাঁধাটা মনমত হচ্ছে না, কোই বাত নেহি, সোনালী মাসির কাছে চলে যাও, সবরকম সাজগোজ সংক্রান্ত ব্যাপারে উনিই ছিলেন শেষ কথা, একটুখানি লিপস্টিক লাগাতে খুব ইচ্ছে করছে? চুপি চুপি ফুলমাসী কে জানালেই হলো, মা'র চোখ বাঁচিয়ে হালকা একটু রঙের ছোওয়া পাওয়া যাবেই। ওদিকে ছেলেরাও কম যান না, দাদুরা যদিও ফিনফিনে ধুতি পাঞ্জাবি পরেই সন্তুষ্ট, যদিও তা যে হত তোরঙ্গের সবচেয়ে দামী জরিপার শান্তিপুরী ধুতিটাই, সেটা বলাই বাহুল্য, কিন্তু আসল পায়তারা চলত মামা আর মেসোদের মহলে। সেখানে দেখতাম সবার পাঞ্জাবির দুই হাতকে একরকম বাদামী রঙের শুকনো বিঁচি দিয়ে কি এক বিশেষ ক্ষমতায় সেজমামা মিহি কুঁচি করে দিচ্ছেন। পরে জেনেছি, সেটাকেই বলত 'গিলে করা', আর ধুতির কুঁচি ঠিক করায় ওস্তাদ মানা হত ফুলমেসোকে, ফলে সে বেচারা সবার ধুতি ঠিক করতে করতে নিজেরটাই যুতসই মত পড়তে পারতেন না। বলতে ভুলে গেছি বিয়ের দিন ভোরের আলো ফুটবার আগেই সবাইকে ঘুম ভাঙিয়ে হাজির করা হত 'বড় ঘরে' যেখানে হবু বর বা কনে কে দই, চিড়ে আরো কি কি সব সু:স্বাদু জিনিস খাইয়ে করা হত 'দধি মঙ্গল'। সেই মনোলোভা বস্তুটির ভাগ আমরা ছোটরাও পেতাম এবং সে জিনিস যে না খেয়েছে তাকে বলে বোঝাতে পারব না এই মাটির পৃথিবীতে অমন স্বর্গীয় খাওয়ার কি করে সম্ভব! বিয়ে সমাধা না হওয়া পর্যন্ত ওই ছিল পাত্র বা পাত্রীর একমাত্র আহার। বিয়ে ঘিরে আরও কত যে মেয়েলি আচার নীতি পালন করা হত সেটা বলতে গেলে এ লেখা আর শেষ হবে না, তাই ওদিকে আর যাচ্ছি না, তবে কনে কে স্নান করবার জন্য কোনো এক

জোড়া সুখী দম্পতি কে আনতে হত পাঁচ পুকুরের জল আর বেয়াই বাড়ি পাঠানোর তত্ব সাজানোর জন্য বিশেষ ভাবে কদর করা হত পাড়ার বড় জেঠি কে। উনি যেভাবে মস্ত বড় এক রুই মাছকে সিঁদুর, শাড়ি পরিয়ে 'সুন্দরী' করে তুলতেন, তাতে বলতেই হয় মহিলার এলেম ছিল বৈকি। এই সব দেখতে দেখতে সারাটাদিন টগবগ করে যেন ফুটতাম আর তারই ফলশ্রুতিতে আসল বিয়ের লগ্ন পর্যন্ত প্রায় সময়ই জেগে থাকতে পারতাম না। জেগে উঠে দেখতাম কাল পর্যন্ত যেই মাসিকে রানীর মত বিচরণ করতে দেখেছি, আজ আর সারা বাড়ি ঘুরেও তাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না, অথবা প্রিয় ফুলমামার পাশে সারাক্ষণ সেঁটে রয়েছে আস্ত নতুন একজন মামী!!

আবছা মনে পরে নতুন মামী শ্বশুর বাড়ি ঢোকার সময় কয়লার আগুনে এমন ভাবে দুধের পাত্র জ্বাল দেওয়া হত যেন নতুন বউ ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে দুধ উথলে পরে। বৈঠক খানা ঘরে সদর দরজার কাছে লম্বা করে বিছানো থাকত এক খানা সাদা চাদর। বউ বাড়িতে পা দেওয়ার আগে পাথরের বড় থালায় দুধে- আলতায় গোলা থাকত, নতুন বউ সেই গোলাপী তরলে পা ডুবিয়ে তারপর সেই সাদা চাদরে তার পায়ের ছাপ ফেলে ফেলে ঢুকত। আরো মনে পড়ছে উঠোনের মধ্যেখানে নতুন বউকে আল্পনা আঁকা পিঁড়িতে দাড় করিয়ে মুখে আর কানে মধু দেওয়া হত আর হাতে ধরিয়ে দেওয়া হত বাজারের ব্যাগের এক মিনি সংস্করণ,যা কিনা সালঙ্করা নতুন বৌএর হাতে খুবই বেমানান। পরে শুনেছি এসবের তাৎপর্য: বৌএর আগমনে দুধ উতরানো মানে সংসার সব সময় উপচে পড়বে, কোনো অভাব থাকবে না; দুধে আলতায় রাঙানো পায়ের ছাপ ছিল লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ আর মুখে, কানে মধু দেওয়া হত যাতে বউ যা শোনে, যা বলে তাই মধুর হয়! সবচেয়ে খারাপ লাগত জেনে যে ওই বিচ্ছিরি বাজারের ব্যাগের ভিতর থাকত এক খানা ভ্যাদা মাছ যাতে বউও অমন ভ্যাদা হয়েই থাকে!! আজকালকার women's rights নিয়ে যারা মাথা ঘামান তারা চাইলে এটা নিয়ে একটা থিসিস লিখতে পারেন বৈকি।

ফিরে আসি আমার গল্পে: পাঠক যদি এতক্ষণে প্রশ্ন করেন গল্পটা আসলে আমার মামার না মাসির বিয়ের? তাকে দোষ দেব না, শুধু বলব, দুই ধরনের বিয়েতেই ছোটবেলায় সামিল হয়েছি, এক্ষেত্রে পাত্র বা পাত্রী মুখ্য নয়, মুখ্য হলো বিয়েকে ঘিরে ঘটনার ঘনঘটা এবং আমার শিশু মনে তার পাকা ছাপ। মাসির বিয়ে হলে মনটা কিছুক্ষণ খারাপ থাকত কিন্তু মামার বিয়েতে এত্ত সব দারুন দারুন ঘটনার মাঝে ফাউ পাওয়া নতুন মামীকে তখন চোখে হারাতাম। কিছুতেই বুঝতে চাইতাম না সারাদিন গায়ের সঙ্গে লেপ্টে থেকে, নতুন শাড়ি আর কান্তা সেন্ট এর গন্ধ বুকভরে নিতে নিতে মামীর সব ফুট ফরমাস খাটলেও, রাতের বেলা কেন আমাকে কেউ মামীর সঙ্গে থাকতে দিত না। ভীষণ অভিমান আর চোখের জল চোখে নিয়েই ঘুমাতে যেতাম।

ঘুমের কথা থেকে আরেকটা মজার ঘটনা মনে পরে গেল, যেটা দিয়ে আমার এই লেখা শেষ করতে চাই। বিয়ে চুকে যাওয়ার পর মা, মাসি, মামীরা একদিন নিজেরা নিজেরা সিনেমা দেখার প্ল্যান করতে লাগলেন এবং আমরা সেটা শুনে মনে মনে খুবই খুশি হলাম কারণ, মা'রা না থাকলে আমরাও ইচ্ছেমত দাপাদাপি করতে পারব এবং মামাত ভাই বাপ্পা চুপি চুপি এও জানিয়েছে যে ছাদে সেজদিদার আচারের বয়মেরা সূর্য স্নান করছে!! আমরা ভাবছি, মা'রা গেলেই বাঁচি, মা'রা তো আর সেটা জানেন না, তারা ভাবছেন ওঁদের অভিসন্ধি জেনে আমরাও যদি সিনেমায় যেতে চাই তাহলেই কর্ম কাবার! অবোধ মহিলারা কি বুঝবেন ৮-৯ বছরের শিশুদের কাছে উত্তম-সুচিত্রার চেয়ে আম-কুল (বরই) এর জুটি অনেক বেশি লোভনীয়। যা হোক, ফুল মাসি এসে গম্ভীর মুখে বললেন, "এ কদিন অনেক অনিয়ম হয়েছে, আজ যদি সবাই লক্ষ্মী হয়ে দুপুরে ঘুমায় তাহলে বিকেলে পার্কের মাঠে খেলতে যাবার সময় আলু-কাবলি খাবার জন্য প্রত্যেকে পাবে আলাদা পয়সা"। পার্কের মাঠের জহরলালদা'র আলুকাবলি ছিল আমাদের ছোটদের কাছে বিশেষ আকর্ষণ, তাই আমাদের আনন্দ আর ধরে না, আমরা হিসেব

কষছি, মা'রা বেরিয়ে গেলে হুটোপুটি + আচার চুরি + সন্ধ্যা বেলা আলু-কাবলি! এযে মেঘ না চাইতেই জল, মহিলারা যায় না কেন?

অবশেষে সবাই কে জোর করে ফুলমামার শ্বশুর বাড়ি থেকে পাওয়া নতুন পালঙ্কে সব কটাকে গাদাগাদি করে শোওয়ানো হলো এবং মাসীরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন কখন আমরা ঘুমিয়ে কাদা হব আর ওঁরাও নি:শ্চিন্তে সিনেমা দেখতে বেরোতে পারবেন। ওদিকে পরবর্তী আকর্ষণের কল্পনায় ঘুম তো তখন দুরে কোথায় বেপাত্তা! মটকা মেরে পরে রয়েছি সব কটা বিচ্ছু আর মনে মনে প্রার্থনা করছি আমাদের ঘুমের অভিনয় যেন উতরে যায়। এই যখন অবস্থা, রুপালি মাসিকে ঘরে ঢুকে বলতে শুনলাম, "দূর ! একটাতেও ঘুমায় নি, ঘুমালে পা নড়তো না?" হায়রে অবোধ বালিকা! কি করে বুঝব যে মাসি চালাকি করে আমরা সত্যি ঘুমিয়েছি কিনা বুঝতে চাচ্ছেন? স্বান্তনা এইটুকুই যে সেদিন মাসির কথা শুনে আমিই কেবল চোখ বন্ধ করে প্রানপনে পা নাড়াইনি, আমার আরও কয়েকজন 'তুতো' ভাই বোনও একই ভাবে বোঝাতে চেয়েছিল যে আমরা গভীর ঘুমে মগ্ন! পরবর্তী ঘটনা পাঠক কল্পনা করে নেবেন। এবারের মত এখানেই শেষ করছি।

সুতপা বড়ুয়া, সিডনী প্রবাসী ইংরেজী শিক্ষিকা (SWSI TAFE)
sutapa.barua@live.com